بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৮ই সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখের জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা এ যুগে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দাসত্বে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে ধর্ম-সংস্কারের উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন। তিনি (আ.) আমাদেরকে ধর্মের মূল, এর ভিত্তি এবং এর প্রকৃত শিক্ষাকে আকর্ষণীয় করে দেখিয়েছেন, বিভিন্ন বিদ'আত এবং ভুল আচার অনুষ্ঠান ও রীতি-নীতি পরিহারের নসীহত করেছেন। অতএব এ যুগে তিনি (আ.) মহানবী (সা.)-এর শিক্ষা এবং তাঁর উত্তম আদর্শের প্রকৃষ্ট উদাহরণ আর এ দৃষ্টিকোণ থেকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আদর্শও আমাদের জন্য আলোকবর্তিকা। আমরা সৌভাগ্যবান! কেননা আমাদেরকে আমাদের পুণ্যবান পিতা-পিতামহ এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবীরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সংক্রান্ত বিভিন্ন রেওয়ায়েত বা ঘটনা শুনিয়েছেন বা পৌঁছিয়েছেন। পুরোনো আহমদীদের অনেকেই এমন হবেন যারা প্রবীণদের কাছে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্পর্কে কিছু ঘটনা এবং রেওয়ায়েত সরাসরি শুনে থাকবেন, যারা (প্রবীণরা) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে দেখেছেন এবং তাঁর সাহচর্যে কল্যাণমণ্ডিত হয়েছেন। যাহোক একস্থানে এসব রেওয়ায়েত বা ঘটনার গুরুত্ব হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) নিজের বিশেষ রীতি অনুসারে বর্ণনা করেছেন। এই ঘটনাগুলো বাহ্যত খুবই ছোট কিন্তু এসব কথা থেকে এবং এসব রেওয়ায়েত বা ঘটনা থেকে অনেক উপদেশ ও ইসলামের মৌলিক শিক্ষা সংক্রান্ত কথা তিনি (রা.) বের করেছেন বা গ্রহণ করেছেন যা এখন আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরব। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর যুগে অনেক সাহাবী জীবিত ছিলেন। তাই তিনি সে সময়ে সেসব রেওয়ায়েত বা ঘটনা একত্রিত করার লক্ষ্যে সাহাবীদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন বা নসীহত করেছেন বা তাদের আত্মীয়-স্বজনের দৃষ্টি এর প্রতি আকর্ষণ করেছেন কেননা, এসব বিষয়ই আগত প্রজন্মের জন্য নসীহত ও প্রকৃত শিক্ষা এবং বিভিন্ন বিষয়ের সমাধান তুলে ধরবে। দ্বিতীয় খলীফা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একস্থানে বলেন, এ বছর একটি কথার প্রতি বিশেষভাবে জামাতের মনোযোগ আকর্ষণ করেছি আর তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর পুরো পটভূমি হলো, এক যুগে জামাতে ফিৎনা মাথা চাড়া দিলে কীভাবে তা প্রতিহত করা উচিত সে বিষয়টি তিনি (রা.) তুলে ধরেন, তুচ্ছাতিতুচ্ছ কথা যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পক্ষ থেকে আমাদের কর্ণগোচর হয় তা আমাদের জন্য সাহায্যকারী ও অনেক নৈরাজ্য থেকে রক্ষাকারী হয়ে থাকে আর অনেক পাপ থেকে আমাদেরকে রক্ষা করে থাকে। যাহোক তিনি যে বিষয় বর্ণনা করছিলেন সে সম্পর্কে বলেন, যতবারই এর গুরুত্বের প্রতি জামাতের মনোযোগ আকর্ষণ করা হোক না কেন তা যথেষ্ট নয়। আর তাহলো, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর

জীবনাচরণ এবং তাঁর কথা সাহাবীদের মাধ্যমে সংকলিত করা। তিনি বলেন, প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি ছোট থেকে ছোট কথাও যদি স্মরণ থাকে তাহলে তার সে কথা গোপণ রাখা এবং অন্যদের কাছে না বলা এটি জাতিগত বিশ্বাসঘাতকতার শামিল। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, অনেক কথা বাহ্যত ছোট হয়ে থাকে বা ক্ষুদ্র হয়ে থাকে কিন্তু অনেক তুচ্ছ কথাও ফলাফলের দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়। তিনি (রা.) বলেন, দেখুন! এটি কত ছোট্ট বা সামান্য একটি কথা, যেমনটি হাদীসে আছে, **"মহানবী (সা.)-এর জন্য একবার কদু বা লাউয়ের তরকারী রান্না করা হয়। তিনি (সা.) গভীর আগ্রহের সাথে সেই তরকারী থেকে বেছে বেছে লাউ খেতে থাকেন। এমনকি এক পর্যায়ে ঝোলে লাউয়ের আর কোন টুকরোই বাকি ছিল না। তিনি (রা.) বলেন, লাউ খুবই উন্নত মানের তরকারী।"** তিনি বলেন, এটি বাহ্যত অনেক ছোট্ট একটি কথা। অনেক আহমদীও হয়তো শুনে বলবে, লাউয়ের কথা বলার কী প্রয়োজন ছিল। আর আজকাল যারা খুব শিক্ষিত সাজে তাদের এসব কথার প্রতি দৃষ্টি যায় না বা মনে করে, এটি সামান্য একটি কথা কিন্তু এই ছোট্ট একটি কথার মাধ্যমে ইসলামের কত বড় উপকার হয়েছে। আজ আমাদের যুগে মুসলমানদের মাঝে যেসব রোগব্যাধি ছড়িয়ে পড়েছে আমরা তা ধারণাই করতে পারি না কিন্তু ইসলামের ওপর এমন একটি যুগও এসেছে যখন ভারতে হিন্দু সংস্কৃতি মুসলমানদেরকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে আর সেই প্রভাবের বশে তারা ধারণা করে বসেছিল, নেক লোক তারাই যারা নোংরা জিনিস খায়, যারা ভাল জিনিস খায় না, যারা উন্নত মানের খাবার খায় না। এটি হলো পুণ্যের মানদণ্ড। কেননা ফকির, দরবেশ বা যোগীদের এটিই রীতি। তারা কাউকে ভাল খাবার খেতে দেখলেই বলে বসে, এ ব্যক্তি পুণ্যবান কীভাবে আখ্যায়িত হতে পারে? অর্থাৎ ধারণাই করা যায় না যে, কেউ পুণ্যবান আখ্যায়িত হয়ে ভাল খাবার খাবে বা খেতে পারে। তিনি (রা.) একটি ঘটনা বর্ণনা করেন, একবার হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) মসজিদে আকসায় দরস প্রদান শেষে নিজের ঘরে ফিরে যাচ্ছিলেন। সেযুগে কাদিয়ানের যেখানে নাযারাতের বিভিন্ন দপ্তর বা অফিস ছিল— তিনি (রা.) যখন সেখানে পৌঁছেন তখন সেখানকার একজন অবসরপ্রাপ্ত হিন্দু ডেপুটির সাথে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর সাক্ষাৎ হয়। তিনি কারো কাছে শুনেছিলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) পোলাও খান, বাদামের তেল ব্যবহার করেন। সব সময় নয় যখনই হস্তগত হয় বা রান্না হতো খেতেন আর বাদামের তেল ব্যবহার করতেন। সেই হিন্দু তখন নিজের ঘরের বাহিরেই বসে ছিল। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-কে দেখে সে বলে, মৌলভী সাহেব! আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। মৌলভী সাহেব অর্থাৎ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, বলো। সে ব্যক্তি বলে, বাদামের তেল খাওয়া এবং পোলাও খাওয়া কি বৈধ? হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, আমাদের ধর্মে এসব জিনিস খাওয়া বৈধ, কোন বাধা নেই। সেই ব্যক্তি বলে, আমার কথার অর্থ হলো, 'ফকরান'- খাওয়া বৈধ কি না? এই শব্দটি পাঞ্জাবী অর্থাৎ যারা ফকির, দরবেশ এবং যারা আল্লাহ্প্রেমী তাদের জন্যও কি খাওয়া বৈধ? যারা বুযূর্গ, যারা পুণ্যবান আখ্যায়িত হয় বা

যাদেরকে পুণ্যবান বলা হয় তাদের জন্যও কি এসব খাওয়া বৈধ? তিনি (রা.) বলেন, আমাদের ধর্মে দরবেশ বা ফকির বা যারা বুযূর্গ আখ্যায়িত হয় সবার জন্য তা বৈধ। একথা শুনে সেই ব্যক্তি বলে, আচ্ছা! এটি বলে সে নীরব হয়ে যায়। হযরত মুসলহ্ মওউদ (রা.) বলেন, দেখ! এই ব্যক্তির মাথায় সবচেয়ে বড় যে আপত্তি এসেছে তাহলো হযরত মির্যা সাহেব মসীহ্ এবং মাহ্দী কীভাবে হতে পারেন, কেননা তিনি পোলাও খান এবং বাদামের তেল ব্যবহার করেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, সাহাবীদের জ্ঞানগত প্রবণতাও যদি তেমনই হতো যেমনটি আজকাল আহমদীদের মাঝে রয়েছে আর কদু বা লাউয়ের কথা যদি তারা হাদীসে উল্লেখ না করতেন তাহলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা হারিয়ে ফেলতাম। হাদীসে আছে, মহানবী (সা.) একবার জুমুআর দিন সুন্দর জোব্বা পরিধান করে মসজিদে আসেন। এখন, যদি এমন কোন ব্যক্তির জন্ম হয় আর সে বলে, পীর-ফকিরদের, বুযূর্গদের এবং পুণ্যবানদের বৈশিষ্ট্য হলো, ভাল কাপড় পরিধান না করা; তাহলে আমরা তাকে এই হাদীসের বরাতে বলতে পারি যে, মহানবী (সা.) জুমুআর দিন পুরো সচেতনতার সাথে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা নিতেন এবং উন্নত মানের সুন্দর পোষাক পরিধান করতেন বরং তিনি পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে এতো বেশি যত্নবান ছিলেন বা এমনভাবে এর ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন যে, কোন কোন সূফী যেমন শাহ্ ওলীউল্লাহ্ সাহেব মুহাদ্দিস দেহলভীর রীতি ছিল, তিনি প্রতিদিন নতুন কাপড় পরিধান করতেন, সেই কাপড় বিধৌত হোক বা নতুনই হোক না কেন।

এরপর তিনি (রা.) হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর ঘটনা বর্ণনা করেন। খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর স্বভাব ছিল খুব সাদাসিধে। অনেক বিষয়ের প্রতি তাঁর মনোযোগও থাকতো না আর কাজের চাপও অনেক বেশি ছিল তাই অনেক সময় তিনি জুমুআর দিন গোসল করতে বা কাপড় পরিবর্তন করতে ভুলে যেতেন আর পূর্ব-পরিহিত কাপড় পড়েই জুমুআর নামাযে চলে যেতেন। এটি তাঁর অনাড়ম্বর জীবন পদ্ধতি ছিল। পীর-ফকিরদের হাব-ভাব প্রকাশ করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না বা এমনটিও নয় যে, পুণ্যবান আখ্যায়িত হওয়ার জন্য আবশ্যক হলো পোশাক পরিবর্তন না করা! বরং কাজের আধিক্যের কারণে তাঁর মনে থাকতো না। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমি যখন তাঁর কাছে বুখারীর পাঠ নেয়া আরম্ভ করি তখন একদিন আমি বুখারী পড়ার জন্য তাঁর কাছে যাচ্ছিলাম। তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাকে দেখেন এবং জিজ্ঞেস করেন, কোথায় যাচ্ছ? আমি বললাম, মৌলভী সাহেবের কাছে বুখারী শরীফ পড়তে যাচ্ছি। তিনি (আ.) বলেন, আমার পক্ষ থেকেও মৌলভী সাহেবকে একটি প্রশ্ন করো, জিজ্ঞেস করো, বুখারীতে কোথাও কি এমন কথা লিখা আছে যে, জুমুআর দিন মহানবী (সা.) গোসল করতেন আর নতুন কাপড় পরিধান করতেন? কিন্তু এখন আমাদের যুগে সুফী মতবাদের কাছে এর অর্থ হলো, মানুষের অগোছালো থাকা। এটিকে যদি ছন্দের রূপ দেয়া হয় তাহলে হয়তো এভাবে তা লেখা যেতে পারে, **'যিতনা গান্দা উতনাহি খুদাকা বান্দা'** অর্থাৎ যত নোংরা থাকবে ততই আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দায় পরিণত হবে। অথচ মানুষ যত অগোছাল এবং নোংরা থাকে ততই সে খোদা থেকে দূরে সরে যায়। সে কারণেই আমাদের শরীয়তে অনেক

ক্ষেত্রে গোসল আবশ্যক করা হয়েছে আর সুগন্ধি লাগানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু খেয়ে বৈঠক বা অধিবেশনে বা মসজিদে আসতে বারণ করা হয়েছে। বস্তুত মহানবী (সা.)-এর জীবনাচরণ থেকে পৃথিবীবাসী উপকৃত হয়েছে আর লাভবান হতে থাকবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জীবনাচরণ থেকেও পৃথিবীর মানুষ লাভবান হতে থাকবে। আমাদের কাজ হলো, সেগুলোকে এক জায়গায় সংকলিত করা।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এক যুবক আমাকে বলেছে, **'আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী কিন্তু একথা ছাড়া আমার আর কোন কিছু মনে নেই, যখন আমি এক ছোট্ট বালক ছিলাম, একদিন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাত ধরি, তার সাথে মুসাহ্ফা বা করমর্দন করি আর কিছুক্ষণ তাঁর হাত আমার হাতে নিয়ে বরাবর দাঁড়িয়ে থাকি। কিছুক্ষণ পর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর হাত ছাড়িয়ে অন্য কোন কাজে রত হন।'** বাহ্যত এটি একটি ছোট্ট কথা কিন্তু পরবর্তী যুগে এসব ছোট-খাটো ঘটনার খুবই গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল নির্ণয় করা হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এই ঘটনাকেই নাও। এটি থেকে একটি বিষয় প্রমাণিত হয়, অল্প বয়স্কদেরকেও পুণ্যবানদের বা বুযূর্গদের মজলিস বা বৈঠকে নিয়ে আসা উচিত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে মানুষ ছোটদের তাঁর (আ.) মজলিসে বা বৈঠকে নিয়ে আসতেন। হয়তো পরবর্তী কোন যুগে এমন মানুষেরও জন্ম হতে পারে যারা হয়তো বলবে, ছোটদের বা শিশুদেরকে বুযূর্গদের অধিবেশনে নিয়ে আসলে লাভ কী। এমন বৈঠকে শুধু বয়স্কদের আসা উচিত। দর্শন যখন আধিপত্য বিস্তার করে তখন এমন অনেক কথার জন্ম হয়, একথা বলা আরম্ভ করা হয়, শিশুদের এখানে কাজ কী? যখনই এমন ধারণা মাথা চাড়া দিবে তখন এই রেওয়ায়েত তাদের এমন ধারণাকে খন্ডন করবে আর এর অতিরিক্ত সমর্থন এভাবে হবে যে, হাদীসে লেখা আছে, মহানবী (সা.)-এর বৈঠকে বা অধিবেশনে সাহাবীগণ নিজেদের সন্তান-সন্ততিকে নিয়ে আসতেন। অনুরূপভাবে এই ঘটনা বা রেওয়ায়েত থেকে এটিও বোধগম্য হয় যে, যখন কোন কাজ থাকে তখন হাত ছাড়িয়ে নিয়ে কাজ আরম্ভ করা উচিত কেননা, এতে উল্লেখ আছে সেই বালক যখন তাঁর (আ.) হাত কিছুক্ষণ ধরে রেখেছিল তখন তিনি তাঁর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে কাজে রত হন। আজ এ কথা বাহ্যত তুচ্ছ মনে হয় কিন্তু হতে পারে কোন যুগে মানুষ মনে করবে, বুযূর্গ সে হয়ে থাকে যার হাত কেউ ধরলে তা ছাড়িয়ে নেয়া উচিত নয় বরং দ্বিতীয় ব্যক্তি যদি তার হাতে হাত রাখে তাহলে প্রথম ব্যক্তির নীরবে দাঁড়িয়ে থাকা উচিত। এমন যুগে এই রেওয়ায়েত বা ঘটনা মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি খন্ডন করতে পারে এবং বলতে পারে, এটি বাজে কাজ বা বাজে কথা। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজের হাত প্রত্যাহার করেন যা থেকে বুঝা যায়, যদি কোন কাজ করতে হয় তাহলে স্নেহের সাথে অন্যের হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নেয়া উচিত, তা সে স্বল্প-বয়স্কই হোক না কেন। এ ধরনের ঘটনা বা রেওয়ায়েত থেকে এমন অনেক বিষয়ের জ্ঞান লাভ হয়। আজ একথাগুলোর গুরুত্ব আমরা বুঝি না {এটি সে যুগের কথা যখন সাহাবীগণ জীবিত ছিলেন, তখন তাদেরকে তিনি (রা.) এই কথা বলেন} কিন্তু যখন আহমদী ফিকাহ্, আহমদী সূফী মতবাদ আর আহমদী দর্শন গঠিত হবে তখন বাহ্যত এই

তুচ্ছ বিষয়ও গুরুত্বপূর্ণ দলীল আখ্যায়িত হবে। আজও এগুলোর গুরুত্ব রয়েছে যা অনুভূত হয়। বড় বড় দার্শনিকরা যখন এসব ঘটনা পড়বেন তখন আনন্দে মাতোয়ারা হবেন অর্থাৎ আনন্দ ও বিস্ময়ে আত্মহারা হয়ে বলবেন, এই ঘটনা বা রেওয়ায়েত বর্ণনাকারীকে আল্লাহ্ পুরস্কৃত করুন। তিনি আমাদের এক জটিল রহস্যের সমাধান উপস্থাপন করেছেন। সমস্যার সমাধানরূপী এমন ঘটনা যখন সামনে আসবে তখন যেসব দার্শনিকের ধর্মের সাথে সম্পর্ক রয়েছে তারা এদিক সেদিক না তাকিয়ে এমন রেওয়ায়েত বা ঘটনা বর্ণনাকারীর জন্য দোয়া করবে। তিনি (রা.) আরো বলেন, এটি এমনই ঘটনা যেমনটি আমরা হাদীসে পড়ি, **"মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) একবার সেজদায় যান। হযরত হাসান (রা.) যিনি সে সময় এক স্বল্প বয়স্ক বালক ছিলেন তিনি তখন তাঁর (সা.) ঘাড়ে বসে পা ঝুলিয়ে দেন। মহানবী (সা.) ততক্ষণ মাথা তুলেন নি যতক্ষণ তিনি (রা.) নিজে উঠে যান নি।"** এখন কেউ যদি নামাযে এ ধরনের গতিবিধি প্রদর্শন করে তাহলে কেউ-কেউ হয়ত তাকে বে-দ্বীন বা বিধর্মী আখ্যা দিবে বা বলবে, এ ব্যক্তির আল্লাহ্‌র ইবাদতের কোন চিন্তা নেই, নিজের সন্তানের আবেগ অনুভূতির প্রতি অনেক বেশি সংবেদনশীল। কিন্তু এমন মানুষ যখনই এই ঘটনা পড়বে সে মানতে বাধ্য হবে, তার ধারণা ভ্রান্ত এবং তার মুখ বন্ধ হয়ে যাবে কেননা, মহানবী (সা.)-এর আদর্শ সামনে রয়েছে। যদিও এমন মানুষও রয়েছে যারা এরপরও মুখ বন্ধ রাখবে না। যেমন এক পাঠানের কাহিনী রয়েছে, সে কদুরীতে (এটি ঘটনাবলীর একটি গ্রন্থ) পড়েছে, হরকতে সাগীরা বা সামান্য নড়াচড়া করলে নামায নষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ নামাযে যদি ছোট-খাট কোন নড়াচড়া হয় তাহলে নামায নষ্ট হয়ে যায়। এই ঘটনা পড়ার পর অর্থাৎ কদুরীর ঘটনা পড়ার পর সে হাদীস পড়া আরম্ভ করে এবং সেখানে এই হাদীস তার সামনে আসে, মহানবী (সা.) একবার নামাযের সময় তাঁর কোন প্রিয় বালককে কোলে তুলে নেন। রুকু এবং সিজদাতে যাওয়ার সময় তাকে নামিয়ে দিতেন আর যখন দাঁড়াতেন তখন আবার কোলে তুলে নিতেন। এই হাদীস পড়তেই সে বলে উঠে, এভাবে তো মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নামায নষ্ট হয়ে গেছে কেননা, কদুরীতে লেখা আছে, সামান্য নড়াচড়া করলে নামায নষ্ট হয়ে যায়। তাদের দৃষ্টিতে যেন শরীয়ত প্রণয়নকারী ছিল কান্‌য্ বা কদুরীর লেখক, হযরত মুহাম্মদ (সা.) নন। এমন মানুষও থাকতে পারে যারা স্পষ্ট নির্দেশনা থাকা সত্যেও তা মানতে অস্বীকার করবে। কিন্তু এমন মানুষের সংখ্যা খুব কমই হয়ে থাকে। অতএব এ কথার প্রতি আদৌ ভ্রুক্ষেপ করা উচিত নয়।

এরপর তিনি (রা.) নসীহত করতে গিয়ে বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যে কথাই তোমার জানা আছে সে কথা যত ছোটই হোক না কেন বরং যত তুচ্ছ কথাই হোক না কেন, এমনকি এতটাও যদি হয় যে, আমি দেখেছি একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হাঁটতে হাঁটতে ঘাসে বসে পড়েছেন— তা-ও বলা উচিত বা বর্ণনা করা উচিত। পরবর্তীতে এই কথা গুলোর গুরুত্বপূর্ণ অর্থ করা হবে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমার মনে আছে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একবার কয়েকজন বন্ধুর সাথে বাগানে যান। তিনি (আ.) বলেন, **'এসো বেদানা খাই (এটি এক ধরনের তুঁত)। তখন কয়েকজন বন্ধু সেখানে চাদর বিছিয়ে**

দেন। তিনি (আ.) গাছে ঝাঁকুনি দিয়ে বেদানা পাড়েন এরপর সবাই এক জায়গায় বসে বেদানা খান।' অনেক বন্ধু পরে হয়তো এমন আসবে যারা বলবে, নেকী এবং সূফী হওয়ার অর্থ হলো, তৈয়্যব বস্তু না খাওয়া। এমন মানুষকে আমরা বলতে পারি, তোমার কথা সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) গাছ থেকে বেদানা পাড়িয়ে খেয়েছেন। অথবা পরবর্তীতে বড় বড় অহংকারী শাসকরা যখন দৃশ্যপটে আসবে, যারা অন্যদের সাথে একত্রে বসে কিছু খেতে সংকোচ বোধ করবে তখন তাদের সামনে আমরা একথা বলতে পারবো, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অকৃত্রিমভাবে বা নিঃসংকোচে বন্ধু-বান্ধবের সাথে একত্রে বসে পানাহার করতেন। তুমি এ বিষয়ে লজ্জা বোধ করার কে? কাজেই কোন কোন কথা ছোট বা তুচ্ছ হলেও পরবর্তী যুগে এগুলোতে বড় গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয়, রাজনৈতিক এবং সামাজিক বিষয়ের সমাধান খুঁজে পাওয়া যায়।

তিনি (রা.) বলেন, যেসব বন্ধুর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর চেহারা দেখা বা তাঁর সাহচর্যে বসার সুযোগ হয়েছে তাদের উচিত সব কথা তা ছোট হোক বা বড় লিখে সংরক্ষণ করা। দৃষ্টান্ত স্বরূপ যদি এমন কোন ব্যক্তি থেকে থাকে যার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পোষাক-আশাকের ধরনের কথা মনে আছে তাঁর তা লিখে পাঠানো উচিত। তিনি (রা.) সে সময় একথাও বলেছেন আর এরপর সাহাবীগণ তাঁদের রেওয়ায়েত বা ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করতে আরম্ভ করেন বা সংকলন আরম্ভ করেন। এসব ঘটনা সম্বলিত অগণিত ঘটনাবলীর রেজিস্টার প্রস্তুত হয়ে গেছে। একবার আমি এগুলো আপনাদেরকে শুনিয়েছি। পূর্বে হাতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিলো এখন নতুনভাবে তা কম্পোজ করা হচ্ছে। বইয়ের আকারে ছাপাতে হলেও যেন ছাপতে পারে। অনেক ঘটনা এমনও আছে বা তাদের অনেকেই যাদের কোন কোন ঘটনার বিরোধ না থাকলেও অন্য অনেক ঘটনার সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্য দেখা যায় না বা এগুলোর তুলনায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অধিক স্পষ্ট আরো কিছু রেওয়ায়েত রয়েছে। তাই কম্পোজ করার সময় এগুলোকে বাদ দেয়া হয়েছে। কিন্তু অনেক ছোট ছোট বিষয় এর মাধ্যমে সামনে আসে। আমাদের অনেক কম্পোজকারী আলেম এমন রয়েছেন যারা কোন কোন বিষয়ে সুপারিশ করেন, এগুলো অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন নেই, এর ফলে এই প্রভাব পড়তে পারে, সেই প্রভাব পড়তে পারে। আমি নিজে যখন পড়ি তখন আমি এমন অনেক রেওয়ায়েত বা ঘটনা পড়েছি যে সম্পর্কে এসব আলেম অপ্রয়োজনীয় সাবধানতা দেখিয়েছেন। এমন রেওয়ায়েত বা সেসব ঘটনাও অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। যাহোক এগুলো একত্রিত বা সংকলিত হচ্ছে। কোন এক সময় জামাতের সামনে এসে যাবে, ইনশাআল্লাহ্।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এসব রেওয়ায়েত বা ঘটনার একটি উপকারিতা এই হবে, ধরুন পরবর্তী যুগে কোন সময় যদি এমন মানুষ সামনে আসে যারা বলবে, খালি মাথায় থাকা উচিত। বাহ্যত এটি ছোট একটি কথা কিন্তু এর মাধ্যমে এমন লোকদের দৃষ্টিভঙ্গিরও খন্ডন হতে পারে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মহানবী (সা.)-এর বিভিন্ন হাদীস রয়েছে। এটি একটি সামান্য বিষয়, খালি মাথায় অনেক সময় মানুষ নামায পড়ে। এসব রেওয়ায়েত বা

ঘটনার মাধ্যমে এদিকেও মনোযোগ নিবদ্ধ হয় কেননা, এতে অনেক ঘটনা এমনও আছে যাতে মসজিদের আদব, নামাযের রীতি-নীতি, বড় কোন বৈঠকে বা মজলিসে বসার আদব এবং শিষ্টাচার ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে। তিনি আরও বলেন, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মহানবী (সা.)-এর বিভিন্ন হাদীস রয়েছে আর তিনি শরীয়তধারী বা শরীয়ত প্রবর্তনকারী নবী। কিন্তু এতেও কোন সন্দেহ নেই, নিকটবর্তী যুগের প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তির কথা শারে' বা শরীয়ত প্রবর্তনকারী ব্যক্তির সত্যায়ন হয়ে থাকে। আজকাল বলা হয়, ফিকাহ্‌র যেসব বিষয়ের ওপর ইমাম আবু হানীফা সহমত পোষণ করতেন সেগুলো বেশি সঠিক; অনুরূপভাবে আগামীতে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর যেসব হাদীসকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজ কর্মের মাধ্যমে সত্য আখ্যা দিয়েছেন সেগুলোকেই মানুষ সঠীক হাদীস জ্ঞান করবে আর যেসব হাদীসকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন অর্থাৎ মানুষ বানিয়েছে বা যেসব হাদীসের রেওয়ায়েত সঠিক নয়, মানুষ সেগুলোকে দুর্বল বা মিথ্যা আখ্যায়িত করবে। অতএব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কথাগুলো সেভাবেই গুরুত্বপূর্ণ যেভাবে হাদীস গুরুত্বপূর্ণ কেননা এই কথাগুলো হাদীসের সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের একটি মাপকাঠি হবে।

তিনি (রা.) আরও বলেন, এসব রেওয়ায়েতে নিঃসন্দেহে এমন কোন কোন কথাও অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে যা সে যুগে অর্থাৎ তাঁর (আ.) যুগে ছাপা হয়তো যুক্তিযুক্ত মনে করা হয়নি কিন্তু সেগুলোর সংরক্ষণ করা হয়েছে। হয়তো এতে এমন কিছু কথাও থাকবে যে কারণে আজও তা ছাপানো যুক্তিযুক্তি হবে না বা প্রকাশ করা হবে না কিন্তু সংরক্ষণ অবশ্যই করা উচিত যা সাহাবীদের বরাতে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। পরবর্তীতে অনুকূল পরিবেশ আসলে তা ছাপানোও যেতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি ইলহাম হয়েছিল, **'সালতানাতে বারতানীয়া তা হাশত্ সাল, বাদ আযাঁ আইয়ামে যো'ফ্ ও ইখতিলাল'** অর্থাৎ ইংরেজ সাম্রাজ্যে আট বছর পর পতনের যুগ আসবে। তিনি (রা.) বলেন, এই ইলহাম তখন ছাপা হয়নি বরং দীর্ঘকাল পর তা ছাপা হয়েছে। কেউ কেউ বলে, এতে রানী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুত্তর যুগের উল্লেখ করা হয়েছে। এর অন্য অর্থও করা যেতে পারে। ইংরেজ সাম্রাজ্য সারা পৃথিবীতে বিস্তৃত ছিল এরপর ক্রমশঃ দুর্বলও হতে থাকে। এমন নয় যে, হঠাৎ করে দুর্বল হয়ে গেছে, দুর্বলতার জন্যও দীর্ঘ সময় প্রয়োজন হয়। সেই দুর্বলতার লক্ষণাবলী প্রকাশ পেয়েছে। যাহোক এটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি ইলহাম ছিল যার বিভিন্ন ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। তিনি (রা.) বলেন, এমন ঘটনা রেকর্ডভুক্ত করা উচিত কিন্তু তখন ছাপা উচিত যখন বিপদের সময় কেটে যায়। তিনি (রা.) বলেন, আমি মনে করি এখনও এই কাজটি সম্পন্ন করার সময় আছে। আর আল্লাহ্ তা'লার ফযলে আমি যেমনটি বলেছি, এই সমস্ত রেওয়ায়েত বা ঘটনাকে সঠিকভাবে সংরক্ষণের চেষ্টা চলছে।

এই প্রসঙ্গে তিনি (রা.) আরো বলেন, আজ পৃথিবীতে ইমাম বুখারীর কত বড় সম্মান রয়েছে কিন্তু তার সম্মানের কারণ হলো, তিনি অন্যদের কাছ থেকে বিভিন্ন রেওয়ায়েত সংগ্রহ করেছেন। তাই সাহাবীদের সন্তানদের যদি কোন রেওয়ায়েত বা ঘটনা জানা থাকে তাহলে

তাদের তা বর্ণনা করা উচিত। এগুলো যদি অন্যান্য রেওয়ায়েতের মাধ্যমে সঠিক প্রমাণিত হয় তাহলে তাও এতে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। হতে পারে কোন কোন রেওয়ায়েত পুরোপুরি রেজিস্টারে আসেনি, সাহাবীদের বংশে বা পরিবারে সেসব ঘটনা বা রেওয়ায়েত পরম্পরা হিসেবে চলে আসছে, তাহলে তারা তা লিখে পাঠাতে পারেন। তিনি (রা.) একথাও বলেন আর এটি সঠিক এবং সত্য কথা, এ সমস্ত রেওয়ায়েত বা ঘটনা বর্ণনাকারীদের জন্য এক যুগে দোয়া করা হবে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের পুরস্কৃত করুন কেননা তারা অনেক সমস্যার সমাধান উপস্থাপন করেছেন।

তিনি (রা.) বলেন, আমি দেখেছি, এমন সময় অজান্তে এমন লোকদের জন্য হৃদয়ে দোয়ার প্রেরণা জাগে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) নিজের একটি ঘটনা বর্ণনা করেন, গতকালই আমি কলীদ-এ-কুরআন (অর্থাৎ একটি বই যার সাহায্যে সহজেই খুঁজে বের করা যায় যে, কুরআনের কোন আয়াত কোথায় আছে) থেকে একটি আয়াত বের করছিলাম। আমার ধারণা ছিল, আয়াতটি খুঁজে পেতে সময় লেগে যাবে কিন্তু কলীদ-এ-কুরআনে তাৎক্ষণিকভাবে আয়াতটি পেয়ে যাই যে কারণে অবচেতন মনেই দু'তিন মিনিট গভীর আন্তরিকতার সাথে এর সংকলকের জন্য দোয়ায় রত হই যেন খোদা তা'লা তার মর্যাদা উন্নীত করেন। তার পরিশ্রমের কারণেই আজ আমি এই আয়াতটি সহজেই পেয়ে গেছি। এসব কাজ এখন অনেক সহজ হয়ে গেছে। বিভিন্ন বই-পুস্তক বা লিটারেচার কম্পিউটারে পাওয়া যায়। আজকাল বিষয় আরও সহজসাধ্য হয়ে গেছে। যারা এসব প্রোগ্রাম বানিয়ে কম্পিউটারে দিয়েছেন তাদের জন্যও আমাদের মন থেকে দোয়া আসে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতিটি কথা নিজের মাঝে এক জ্ঞানগত দিক বা আঙ্গিক রাখে যা আমাদের জন্য আবশ্যক। আর ব্যবহারিক তরবীয়তের জন্যও তা আবশ্যক কেননা তরবীয়তের অনেক দিক এরফলে সামনে আসে, পবিত্র কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা সামনে আসে, হাদীসে বিবৃত বিষয়গুলো এরফলে সুস্পষ্ট হয়ে যায় আর আমরা উপকৃত হই। যে আহমদীই এটি শুনবে, যার মাধ্যমেই শুনুক, সে সেটি থেকে লাভবান হবে আর অবশ্যই এগুলোর সংকলনকারীদের জন্য দোয়াও করবে। কাজেই এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় যে দিকে অনেক সময় মানুষের পুরো মনোযোগ থাকে না। আমার মনে আছে সাহাবীদের ঘটনাবলী যখন বর্ণনা করা আরম্ভ করেছিলাম তখন কিছু মানুষ যারা সাহাবীদের সন্তান, পারিবারিকভাবে বা পরম্পরাগতভাবে যা তাদের বংশে চলে আসছে এমন অনেক ঘটনা বা রেওয়ায়েত তারা লিখে পাঠিয়েছেন। তাদের উচিত হবে এসব রেওয়ায়েত বা ঘটনা যথারীতি লিখে তসনীফে পাঠানো। প্রয়োজনে পরবর্তীতে এডিশনাল ওকালতে তসনীফ ঘটনাবলী যাচাইয়ের জন্য নির্দিষ্ট কমিটির কাছে লিখে পাঠাবেন। এখন আমি আরও একটি ঘটনা বর্ণনা করছি যা আজও অনেক প্রশ্নকারীর বিভিন্ন প্রশ্নের সমাধান দিয়ে থাকে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) শুরু থেকেই ইসলামের উন্নতির জন্য ব্যাকুল ছিলেন। তিনি চাইতেন মুসলমানরা নিজেদের ব্যবহারিক অবস্থার সংশোধন করুক আর ব্যবহারিক অবস্থার

সংশোধনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, খোদা তা'লার ইবাদতের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা, নামায পড়া। তাই তিনি কাদিয়ানের মুসলমানদের জন্য মসজিদে এসে নামায পড়ার একটি পৃথক ব্যবস্থা করেন। এই ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) অ-আহমদীদের কথার খন্ডন করেন। যারা বলতো অর্থাৎ যারা তখন অপবাদ আরোপ করতো আর আজও করে, আহমদীরা মুসলমান নয় এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নাঊযুবিল্লাহ্ কোন নতুন শরীয়তের সূচনা করেছেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তাদের উত্তর দিচ্ছেন, হযরত মির্যা সাহেব অর্থাৎ মসীহ্ মওউদ (আ.) আহমদীয়া মুসলিম জামাত প্রতিষ্ঠার পূর্বেই এখানকার মুসলমানদের অবস্থা দেখেন যে, তারা নামাযের প্রতি অমনোযোগী। তিনি স্বয়ং লোক পাঠিয়ে তাদের মসজিদে ডাকতে আরম্ভ করেন। মুসলমানরা আপত্তি করে ঠিকই কিন্তু আজও আর সব সময় এই রীতিই চলে আসছে, সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী নামাযের প্রতি অমনোযোগী। তিনি (আ.) লোক পাঠিয়ে মানুষকে মসজিদে ডাকতে আরম্ভ করেন। বেশির ভাগ মানুষ যেহেতু কৃষিজীবি ও দরিদ্র শ্রেণীর ছিল তাই তারা অজুহাত দেখায়, নামায পড়া ধনীদের কাজ, আমাদের কাজ নয়। আমরা দরিদ্র মানুষ আয়-উপার্জন করবো না-কি নামায পড়বো, কায়িকশ্রম করবো নাকি নামায পড়বো? কাজ না করলে উপাস থাকতে হবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তখন যে উদ্যোগ নেন তাহলো, তিনি বলেন, ঠিক আছে নামায পড়তে আসলে তোমরা এক বেলার খাবার পাবে। সেই ঘোষণার পর কয়েক দিন খাবারের লোভে পঁচিশ-ত্রিশ জন মানুষ নামাযের জন্য মসজিদে আসতে আরম্ভ করে কিন্তু এরপর আবার তারা অলস হয়ে পড়ে আর শুধু মাগরিবের সময় যখন খাবার বিতরণ করা হতো তখন তারা মসজিদে আসতো। অবশেষে এই ব্যবস্থা বন্ধ করে দিতে হয়।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, দেখ! হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই একাগ্রতা আর আন্তরিকতার উদ্দেশ্য হলো, ইসলামের সত্যিকার চিত্র তুলে ধরা। আর তাঁর এই আগ্রহ এবং একাগ্রতা দেখে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণ করেছেন। আর এখন অর্থাৎ যখন একথা বলেছেন তখন কাদিয়ানে চারটি মসজিদ রয়েছে যার মাঝে দু'টো তো অনেক বড় আর পাঁচবেলা এখানে নামায হয় এবং নামাযীতে পরিপূর্ণ থাকে।

অতএব একথা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত, এই যে ব্যাকুলতা যা দাবীর পূর্বেও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হৃদয়ে বিরাজমান ছিল, এর প্রতি তাঁর দাবির পূর্বেও এবং দাবির পরেও বারংবার তিনি মনোযোগ আকর্ষণ করেন, নামাযের দিকে আসো, জামাতবদ্ধভাবে নামায পড়, মসজিদ আবাদ কর। এখন পৃথিবীর সর্বত্র আল্লাহ্ তা'লার ফযলে আমাদের মসজিদ নির্মিত হচ্ছে কিন্তু মসজিদ আবাদ করার প্রতি যেভাবে মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়া উচিত তেমন মনোযোগ নেই। অনেক স্থান থেকেই অভিযোগ আসে। অনুরূপভাবে রাবওয়ায়, কাদিয়ানে, পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় আহমদীদের উচিত মসজিদ আবাদ করার প্রতি মনোযোগ দেয়া। একইভাবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও মসজিদগুলো আবাদ করার প্রতি মনোযোগ দেয়া উচিত। দ্বিতীয়ত এ আপত্তিরও এখানে খন্ডন দেখা যায়। অনেকেই আমাকে

লিখে, যুবকদের মসজিদমুখী করার জন্য তারা সেখানে খেলাধূলার ব্যবস্থা করেছেন যেন ছেলেরা সন্ধ্যায় এসে খেলতে পারে। এভাবে খেলার লোভ দেখিয়ে নামায পড়ানো এটি তো এমন কোন পুণ্যের কাজ হলো না। অনুরূপভাবে কেউ কেউ বলে, কোন কোন অনুষ্ঠানে খাবারের ব্যবস্থা থাকে। মানুষ অনুষ্ঠানে আসে বা নামায পড়তে আসে খাবারের টানে। এটি একটি কু-ধারণা যা কেউ কেউ করে থাকে। কিন্তু মসজিদের সাথে যেখানে হল নির্মিত হয়েছে বা যেখানে মুরুব্বী বা মুবাল্লিগ রয়েছেন যারা নিজেরাও যুবক এবং খেলাধূলাও করেন, মাঠে খেলাধূলার মাধ্যমে যুবকদের সমবেত করা আরম্ভ করেন। এরফলে একটি উপকারী দিক তো অবশ্যই সামনে আসছে, অন্ততঃপক্ষে দু'এক বেলা এই দিকে যুবকদের মনোযোগ নিবদ্ধ হয় এবং মসজিদ আবাদ হয়। তাই একথা বলা যে, এটি কোন অপরাধ বা মসজিদের সাথে খেলার হল কেন বানানো হয়েছে বা মসজিদে আনার জন্য বা কোন অনুষ্ঠানে আনার জন্য খাবারের ব্যবস্থা কেন করা হয়েছে এগুলো অমূলক আপত্তি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আমল থেকে প্রমাণিত হয় যে, এমনটি হতে পারে এবং এমনটি করলে কোন অসুবিধা নেই।

নামাযের পর এখন আমি দু'জনের গায়েবানা জানাযা পড়াব। একটি হলো আলহাজ্জ্ব ইয়াকূব বিন সাহেবের যিনি ঘানা নিবাসী। ২০১৫ সনের ৩০শে আগষ্ট তিনি ইন্তেকাল করেছেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। এক ধারণা অনুসারে তার বয়স ছিল শতাধিক বছর। মধ্য ঘানার সাথে তার সম্পর্ক। তার দাদা খ্রিস্টান ছিলেন কিন্তু তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করেন। দ্বিতীয় বিয়ে করার পর প্রেসপিটেরিয়ান গীর্জা তাকে চার্চ থেকে বহিষ্কার করে। এই কারণে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং একত্ববাদী হয়ে খোদার ইবাদত আরম্ভ করেন। এরপর তার দাদা অর্থাৎ আলহাজ্জ্ব ইয়াকূব সাহেবের দাদা ইব্রাহীম উদোবো সাহেব হজ্জ্বে যাওয়ার জন্য অর্থকড়ি জমান। এরপর তিনি আহমদীয়াতও গ্রহণ করেন। যখন অর্থ জমা করেন তখন তিনি আহমদী ছিলেন। তিনি সল্টপন্ড পৌঁছলে সেখানকার মুবাল্লিগ ইনচার্জ তাহরীক করেন, আজকাল হেডকোয়ার্টার নির্মীত হচ্ছে এর জন্য আমরা চাঁদা সংগ্রহ করছি। তিনি হজ্জ্বের উদ্দেশ্যে যে টাকা জমিয়েছিলেন তা মসজিদ এবং হেডকোয়ার্টার নির্মাণের জন্য হস্তান্তর করেন। এরপর খোদা তা'লা তাকে এত দীর্ঘায়ু দিয়েছেন, দীর্ঘকাল পর তার পৌত্রকে তিনি নিজের খরচে হজ্জ্ব করিয়েছেন। আলহাজ্জ্ব ইয়াকূব সাহেব অত্যন্ত পরিশ্রমী, কুরবানী ও ত্যাগের চেতনায় সমৃদ্ধ একজন মানুষ ছিলেন। মৌলভী আব্দুল ওয়াহাব আদম সাহেব যখন ঘানার আমীর মনোনীত হন তখন খলীফা সালেস (রাহে.) তাকে সেখানে পাঠান এবং ঘানা মিশনের তবলীগের কাজকে বেগবান করার জন্য তাকে নসীহত করেন। আলহাজ্জ্ব ইয়াকূব সাহেব তখন দাঈয়ানে ইলাল্লাহ্ বা তবলীগকারীদের জন্য একটি গাড়ি উপহার দেন। যাতে লেখা থাকতো 'আহমদীয়া মুসলিম প্রিচার এসোসিয়েশন' অর্থাৎ আহমদীয়াত প্রচারকারীদের সংগঠন। তিনি এর মাধ্যমে অনেক তবলীগি অনুষ্ঠান করেছেন। তার আরো একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, যেখানে জামাত গঠিত হতো এবং নতুন বয়আতকারীরা সমবেত হতো সেখানেই নিজের খরচে মসজিদ নির্মাণ করতেন। তিনি ওয়াকেফে যিন্দেগী এবং মুবাল্লিগদের কল্যাণের প্রতিও গভীর মনোযোগী ছিলেন। তার দুই

পুত্রও ওয়াকেফে যিন্দেগী। একজন কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ ইব্রাহীম বিন ইয়াকূব সাহেব যিনি ত্রিনিদাদে আমাদের মুবাল্লিগ ইনচার্জ এবং আমীর আর দ্বিতীয়জন সেখানকার স্থানীয় মুবাল্লিগ নূরুদ্দীন বাবিন সাহেব, যিনি উত্তরাঞ্চলে জামাতের সেবার সুযোগ পাচ্ছেন। আলহাজ্জ্ব বাবিন সাহেব রাবওয়াও গিয়েছেন। মূসী ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তার হিস্যায়ে জায়েদাদ এবং হিস্যায়ে আমদ পরিষ্কার ছিল অর্থাৎ পরিশোধ করে দিয়েছেন। আমি যখন ঘানায় ছিলাম তখন আমি দেখেছি, তিনি বড় নিবেদিতপ্রাণ দাঈ ইলাল্লাহ্ ছিলেন। সবসময় তবলীগের জন্য প্রস্তুত থাকতেন। তিনি হাসিখুশি থাকতেন। একই সাথে অসাধারণ বিনয়ীও ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার সন্তান-সন্ততি ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে তার পুণ্যকাজ গুলোকে ধরে রাখার তৌফিক দান করুন।

দ্বিতীয় জানাযা হবে আমাদের জামাতের দীর্ঘকাল খিদমতকারী জনাব মৌলানা ফযলে ইলাহী বশীর সাহেবের। কোন কারণে তার জানাযা পড়া সম্ভব হয়নি দাপ্তরিক ভুল বোঝাবুঝির কারণে। তিনি ৩রা আগষ্টে ৯৭ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون। ১৯১৮ সনে তার জন্ম হয় জনাব চৌধুরী করম ইলাহী চিমা সাহেবের ঔরসে। মৌলভী সাহেব ১৯৪৪ সনের ২৪শে নভেম্বর জীবন উৎসর্গ করেন। ৩রা জুন, ১৯৪৪ সনে কাদিয়ান পৌঁছেন। ১৯৭৮-এ রীতিমত অবসর গ্রহণ করেন কিন্তু ১৯৯৩ পর্যন্ত রিএমপ্লয় হতে থাকেন এবং জামাতের কর্মী হিসেবে রীতিমত জামাতের কাজ অব্যাহত রাখেন। বরং শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তিনি স্বেচ্ছাসেবার ভিত্তিতে জামাতের অনেক কাজ করেছেন। বিশেষ করে প্রুফ রিডিং ইত্যাদির কাজ অব্যাহত রাখেন। লিখা হয়েছে, তার পিতা করম ইলাহী সাহেব ১৮৯৮ সনে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেছেন। এক বছর পর তার দাদা চৌধুরী জালালুদ্দিন সাহেবও বয়আত করেন। জামাত এবং খিলাফতের সাথে তার পিতার সম্পর্ক অনেক সুদৃঢ় ছিল আর খোদা তা'লাও তাকে পথের দিক-নির্দেশনা দিতেন। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইন্তেকালের পর তাৎক্ষণিকভাবে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর হাতে বয়আত করেন আর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর ইন্তোকালের পর অনতিবিলম্বে দ্বিতীয় খলীফার হাতে বয়আত করেন বরং তাকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে যে, ইনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী অর্থাৎ হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ পরবর্তী খলীফা। তিনি ওসীয়্যত করেছেন বরং এক অষ্টমাংশ ওসীয়্যত করেছেন।

নিজের জীবন উৎসর্গ করার ঘটনা মৌলভী সাহেব নিজেই বর্ণনা করেন, তার মা তাকে শুনিয়েছেন, আমি কোলে ছিলাম মনে হয় ১৯১৯ বা ২০ সনের কাদিয়ানের সালানা জলসা ছিল। মহিলাদের জলসাগাহে হযরত হাফেয গোলাম রসূল উযীরাবাদী সাহেব বক্তৃতায় বলেন, হে ভদ্রমহিলাগণ! আমরা এখন প্রৌঢ়। তিনি সাহাবী ছিলেন। ধর্মের খিদমতের জন্য আমাদের এমন লাকদের প্রয়োজন যারা আমদের স্থলাভিষিক্ত হবে। তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে ধর্মের খিদমতের জন্য উৎসর্গ কর। তাদেরকে পড়ালেখার জন্য কাদিয়ান পাঠাও। সেই বক্তৃতাকালে আমার মা আল্লাহ্ তা'লার সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন আর দোয়া করেন, এই সন্তান

ফযলে ইলাহীকে খোদার পথে উৎসর্গ করব। ১৯৩১ সনে যখন তিনি মাধ্যমিকে ভর্তি হন তখন তার পিতা তাকে মায়ের এই অঙ্গীকার সম্পর্কে অবহিত করে বলেন, যদি জাগতিক পড়ালেখা অব্যাহত রাখতে চাও তাহলে শিক্ষা শেষে আমার এমন পজিশন আছে যে, আমি তোমাকে তহশীলদারের পদ পাইয়ে দিতে পারি। এটি সেযুগে অনেক বড় একটি সম্মানজনক পদ ছিল। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে বলেন, আমি ওয়াক্‌ফ করে কাদিয়ান যেতে চাই।

১৯৪৭ সনের ২৩শে ফেব্রুয়ারী তিনি অন্যান্য মুরুব্বীর সাথে পূর্ব আফ্রিকার মোম্বাসা বন্দরে পৌঁছেন। এসব মুরুব্বীর মাঝে মীর যিয়াউল্লাহ্ সাহেব, মৌলভী জালাল উদ্দীন ক্বমর সাহেব, সৈয়্যদ ওলীউল্লাহ্ শাহ্ সাহেব, হাকীম মুহাম্মদ ইব্রাহীম সাহেব, মুহাম্মদ এনায়েতউল্লাহ্ সাহেব প্রমূখ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আর পূর্ব আফ্রিকায় মুবাল্লিগ ইনচার্জ ছিলেন, শেখ মুবারক আহমদ সাহেব। দীর্ঘকাল তাঁর কেনিয়া, সুরিনাম, গায়ানা, ইরান ইত্যাদি স্থানে মুবাল্লিগ হিসাবে খিদমতের সুযোগ হয়েছে। এরপর কেন্দ্রীয় বিভিন্ন অফিসে আঞ্জুমান এবং তাহরীকে জাদীদে সেবা অব্যাহত রাখেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) ওসীয়্যতের নিয়ম-কানুন সম্পর্কে অভিনিবেশ এবং প্রণিধানের জন্য যে কমিটি গঠন করেন মৌলভী সাহেবও সেই কমিটির সদস্য ছিলেন। তিনি আরবী, ইংরেজী এবং ফ্রেঞ্চ ভাষায় প্রায় এগারটি বই-পুস্তক লিখেছেন। তিনি দু'টি বিয়ে করেছিলেন। প্রথমটি চৌধুরী মুহাম্মদ দ্বীন সাহেবের কন্যার সাথে যিনি শিয়ালকোটে সাহী ছিলেন। তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করেন মরিশাসে।

দোয়া গৃহীত হওয়া সংক্রান্ত শৈশবের একটি ঘটনা তিনি শোনান। একবার যখন তার বয়স দশ বা বারো বছর ছিল তার মা প্রচন্ড অসুস্থ হয়ে পড়েন এমনকি জীবনের কোন আশাই ছিল না। তিনি বলেন, মা মারা যাবেন এই ধারণার বশবর্তী হয়ে আমি নিরাশ হয়ে যাই। আমি দোয়া করি, হে আল্লাহ্! এই বয়সেই কি আমাকে মায়ের ছায়া থেকে বঞ্চিত করবে? এই দোয়ার পর কয়েক মিনিট অতিবাহিত হতেই আমার পিতা ঘর থেকে বেরিয়ে আমার দিকে আসেন এবং আসতেই বলেন, ফযল ইলাহী! তোমার মা সুস্থ হয়ে গেছেন।

তিনি কাবাবীরেও ছিলেন (ফিলিস্তিনে)। শরীফ অওদা সাহেব লিখেন, তিনি ১৯৬৬ থেকে ৬৮ আর ১৯৭৭ থেকে ৮১সাল পর্যন্ত তিনি ফিলিস্তিনে কাজ করেছেন। কাবাবীরে অবস্থানকালে তবলীগ এবং তরবীয়তের কাজ কঠোর পরিশ্রম এবং একাগ্রতার সাথে করতেন। মানুষের ঘরে গিয়ে দরস এবং কুরআনের তফসীর সংক্রান্ত দরস দিতেন। কাবাবীরে আহমদীয়া স্কুলের প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে দৃঢ় ভিতে প্রতিষ্ঠিত করেন। বহু তবলীগি ট্যুর বা সফর করতেন। বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে জামাতী লিফলেট বিতরণ করতেন। তিনি বলেন, আমি ছোট ছিলাম। তার সাথে বিভিন্ন তবলীগি সফরে যেতাম। অনেক কিছু শিখেছি তার কাছ থেকে। মরহুম অসাধারণ পরিশ্রমী এবং ধর্মের খিদমতের এক জ্বলন্ত উদাহারণ ছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইলহাম **'আনতা শাইখুল মসীহুল্লাযি লা ইয়ুযাউ ওয়াক্তুহু'** ইলহামকে সবসময় দৃষ্টিপটে রাখতেন। কখনও নিজের সময় নষ্ট করতেন না। সেখানে একটি পত্রিকা আল-বুশরাও তিনি প্রকাশ করতেন। আর নিজেই এর সব কাজ করতেন। নিজেই কম্পোজ করতেন, নিজেই

লিখতেন এবং ছাপতেন। সব কাজ একাই করতেন। কাবাবীরের মসজিদের সূচনাও তার হাতেই হয়েছে। মসজিদের প্রথম ভিত্তি প্রস্তরও তিনি নিজ হাতে রেখেছিলেন।

একবার তিনি বলেন, ১৯৪০ সনে তার পিতা হযরত করম ইলাহী সাহেব যখন অবসর গ্রহণ করেন তখন ঘরে অনেক অসচ্ছলতা দেখা দেয়। এমনকি যখন কাদিয়ানে পড়তেন তখন মাদ্রাসা আহমদীয়ার ফিস পরিশোধ করাও সম্ভব হয়নি। একবার প্রিন্সিপাল সাহেবের পক্ষ থেকে নোটিস পান, ইনি আসলে মাদ্রাসা আহমদীয়ার হেডমাস্টার ছিলেন, বলেন, সাত দিনের মধ্যে ফিস জমা কর নতুবা মাদ্রাসা থেকে বের করে দেয়া হবে। এরপর তিনি মাদ্রাসায় যাওয়া বন্ধ করে দেন। কিছুদিন পর হযরত মির্যা নাসের আহমদ সাহেব খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহ.) তাকে ডেকে বলেন, মাদ্রাসায় কেন আসছো না? তিনি বলেন, ফিস দিতে পারছি না তাই লজ্জার কারণে আসা বন্ধ করে দিয়েছি। হযরত মির্যা নাসের আহমদ সাহেব বলেন, ফিসের ব্যবস্থা আমি করছি। তিনি বলেন, আমি সদকা নিব না, আমাকে ঋণ দিন। এভাবে তিনি নিজের পড়াশুনা অব্যাহত রাখেন। কিন্তু ১৯৪০ থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত দারিদ্রের কষাঘাতে চরমভাবে জর্জরিত ছিলেন। তখন অনাহার যাপন করতে হতো। তিনি বলেন, একবার অবস্থা এমন হয়েছে যে, প্রায় ছাপ্পান্ন ঘন্টা পর্যন্ত খাবার কিছুই পাইনি আর কাউকে জানাইওনি। ছাপ্পান্ন ঘন্টা পর একবন্ধু বলেন, আজকে আপনি আমার সাথে খাবার খান। এভাবে ছাপ্পান্ন ঘন্টা পর আল্লাহ্ তা'লা তাকে একটি রুটি খাইয়েছেন। আর এই একটি রুটি খাওয়ার পর পুনরায় আটচল্লিশ ঘন্টা অনাহারে কাটিয়েছেন। তিনি বলেন, এই যে অনাহার যাপন এটি হয়তো আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে সহ্যশক্তির জন্য প্রশিক্ষণস্বরূপ ছিল। তবলীগের সমস্যার সময় এটি আমার কাজে এসেছে। তবলীগের সমস্যার কথাও উল্লেখ করেছেন। অনেক সময় আফ্রিকান বন্ধুদের সাথে তবলীগি সফরে যেতেন। তখন অনাহারে কাটাতে হতো। কখনও ভাল খাবার হস্তগত হতো আর যা পেতেন তাই খেয়ে নিতেন। কখনো এই কথা ভাবেননি, আমরা ধর্মের অনেক খিদমত করছি। এটি আজকের ওয়াকেফে যিন্দেগীদের সামনে রাখা উচিত। এখন তো আল্লাহ্ তা'লার ফযলে সর্বত্র অবস্থা অনেক ভাল। এখন আর কাউকে অনাহারে থাকতে হয় না।

তিনি সারা জীবন খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করেছেন। মাধ্যমিকের পর জীবন উৎসর্গ করেন। শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত এই অঙ্গীকার রক্ষা করেছেন, ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দিব। তার পৌত্রী লিখেছেন, দাদাজান তবলীগের সময় যেসব পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন তা খুব কমই বলতেন কিন্তু একটি কথা তিনি বলেছেন, যখন তবলীগের জন্য যেতাম সকাল বেলা দু'টো রুটি বানিয়ে নিতাম। একটি সকালে খেতাম আর অপরটি সাথে করে নিয়ে যেতাম। রাস্তায় কোন জায়গায় পানি বা চায়ের সাথে খেয়ে নিতাম। আফ্রিকায় যখন ছিলেন সেখানকার মানুষও এর সত্যায়ন করেছেন, এভাবে দু'টো রুটি বানাতেন আর তবলীগের উদ্দেশ্যে বেড়িয়ে যেতেন।

সুরিনামের মুবাল্লিগ সাহেব লিখেন, ১৯৭০ থেকে ৭২ পর্যন্ত গিয়ানার মুবাল্লিগ হিসেবে খিদমত করার সৌভাগ্য হয়েছে তার। সুরিনামে বিভিন্ন স্থানে বেশ কয়েকবার সফর করেছেন।

১৯৭১ সনের ২৫শে এপ্রিল জামাতের প্রথম ঐতিহাসিক মসজিদের উদ্বোধনের সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি বড় প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে এখানে সময় কাটিয়েছেন। সেখানে লাহোরীদের সংখ্যা অনেক বেশি, লাহোরীদের বিরোধিতা ছাড়াও, সুরিনামে জামাতের ভেতর খাজা ইসমাঈলের একটি দল গড়ে উঠে যারা অনেক সমস্যা সৃষ্টি করেছে তাঁর জন্য। তারা সকল চেষ্টা করেছে মসজিদের জমি যেন জামাতের নামে স্থানান্তরিত না হয়। তিনি খুবই বীরত্বের সাথে সেই পরিস্থিতির মোকাবিলা করেছেন এবং গভীর একাগ্রতার সাথে জামাতের সেবায় রত ছিলেন। সত্যের বাণী প্রচারের পাশাপাশি কেন্দ্রকে জামাতের অবস্থা সম্পর্কে রীতিমত অবহিত করতে থাকেন। ১৯৭২ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-কে তিনি লিখেন, সুরিনামে মসজিদ এবং মিশন হাউসের মাধ্যমে জামাতের একটি কেন্দ্র হস্তগত হয়েছে কিন্তু গায়ানায় এখন পর্যন্ত কোন কেন্দ্র নেই। তারা কেন্দ্র থেকে বঞ্চিত অথচ বারো বছর ধরে সেখানে জামাতের মুবাল্লিগ রয়েছে। এই কারণে আমার হৃদয়ে গভীর আকাঙ্খা জাগে, সেখানেও মসজিদ চাই চাই। মুবাল্লিগ ইনচার্জ সাহেব লেখেন, বিশেষ পরিস্থিতিতে মরিশাসে তাকে নিযুক্ত করা হয়, ১৯৫৪ সনে কিছু মানুষ জনাব বশীরুদ্দিন উবায়দুল্লাহ্ সাহেবের কথা মানতে অস্বীকার করলে সেখানে জামাত দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এক অংশ ইতায়াত থেকে সরে যেতে থাকে এবং তারা নিজেদের পৃথক সংগঠন গড়ে তুলে। তিনি সে সময় ফিলিস্তিনে ছিলেন, তখন দ্বিতীয় খলীফা (রা.) তাকে সংবাদ পাঠান, অনতিবিলম্বে মরিশাস পৌঁছুন। তিনি মরিশাস পৌঁছেন। তার বিরুদ্ধে ইমিগ্রেশনে অভিযোগ করা হয় কিন্তু তার কাছে যেহেতু বৃটিশ নাগরিকত্ব ছিল তাই সরকার তাকে দেশে প্রবেশ করার অনুমতি দিতে বাধ্য হয়। তিনি বড় প্রজ্ঞার সাথে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেন এবং বুদ্ধিমত্তার সাথে মুনাফিকদের বা মুর্তাদদের যেই নিয়ন্ত্রণ ছিল সেই পরিস্থিতিতে মসজিদে যান এবং নামায পড়ানো আরম্ভ করেন আর ধীরে ধীরে বয়আতকারীদের পুনরায় মসজিদে একত্রিত করতে আরম্ভ করেন। সে যুগেই মরিশাসে তিনি দ্বিতীয় বিয়েটি করেন। এখানে তিনি ফ্রেঞ্চ ভাষায় কিছু বই-পুস্তকও লিখেছেন যা আমি পূর্বেই বলেছি। এভাবে আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপায় জামাতকে তিনি পরীক্ষার হাত থেকে রক্ষা করেন এবং নতুনভাবে জামাতকে এক হাতে ঐক্যবদ্ধ করেন।

মসজিদ মুবারকে জুমুআ পড়ার ব্যাপারে তার ভেতর গভীর আগ্রহ দেখা যেত। জুমুআয় যাওয়ার জন্য একজনকে তিনি বলে রেখেছিলেন, আমাকে তোমার গাড়িতে করে নিয়ে যেও; তার যেন কষ্ট না হয় এবং তাকে যেন অপেক্ষা করতে না হয় এজন্য তিনি ঘরের দরজার বাইরে চেয়ার পেতে বসে থাকতেন যেন সে আসামাত্রই তার সাথে চলে যেতে পারেন। দরিদ্রদের সাধ্য অনুসারে সাহায্য করতেন। একবার এক গরীব মানুষ লিখে, আপনি আমার সন্তানের শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করেন। এবার তার কিছু বেশি টাকার প্রয়োজন। তাই আপনি মানি অর্ডারে কিছু বেশি টাকা পাঠিয়ে দেবেন। তিনি ঘরে কাউকে কখনও তা বলেননি। ঘটনাক্রমে তার পুত্রবধূর হাতে একটি চিঠি আসে আর তখনই একথা জানা যায়, তিনি নীরবে মানুষকে সাহায্য করতেন। তার পুত্রবধূ বলেন, একবার তাকে বললাম, বহির্বিশ্বে তবলীগের

কোন ঘটনা শোনান। তিনি বলেন, আজকে একটি ঘটনা তোমাকে শুনাচ্ছি। তিনি বলেন, আমার রীতি ছিল প্রত্যেক দিন ফজরের নামাযের পর কিছুটা অন্ধকার থাকতেই আমি তবলীগের জন্য বেড়িয়ে যেতাম আর সন্ধ্যার সময় ফিরে আসতাম। একদিন সন্ধ্যায় যখন ঘরে ফিরে আসি তখন দেখি, অনেক মানুষ আমার ঘরের সামনে সমবেত। আমার কিছুটা চিন্তা হলো, আল্লাহ্ মঙ্গল করুন! এরা আমার অপেক্ষায় কেন দাঁড়িয়ে আছে। তারা দূর থেকেই বলতে আরম্ভ করে, মৌলানা সাহেব! আপনাকে অভিনন্দন। আমি বললাম, কিসের অভিনন্দন জানাচ্ছ? তারা বলে, আপনি আজ সকালে যখন যাচ্ছিলেন তখন একটি সিংহ এবং আপনি এক সাথে হাঁটছিলেন। একবার সিংহ আপনার সামনে আর আপনি সিংহের পিছনে আর আরেকবার আপনি সিংহের সামনে আর সিংহ আপনার পিছনে ছিল কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে নিরাপদ রেখেছেন। এজন্য আমরা আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। অনেকেই জঙ্গলে বা অরণ্যে কাজ করার সময় তাকে এভাবে দেখেছে।

তিনি নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়তেন। বিগলিতচিত্তে নামায পড়তেন। আরও অনেক মুবাল্লিগ তার জীবনের বিভিন্ন কথা লিখে পাঠিয়েছেন। তিনি সত্যিকার অর্থে খোদার ওপর নির্ভরকারী মুতাওয়াক্কেল একজন মানুষ ছিলেন। দৃঢ়চেতা, ধৈর্যশীল, গভীর ধর্মানুরাগী, ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্যদাতা ছিলেন। যে কয়েকটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে তাতে কোন অতিরঞ্জন নেই। খিলাফতের সাথে তার সুগভীর সম্পর্ক ছিল। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার সন্তান সন্ততিকে পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত।